অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

ISSN 2222-5188

ইনফো মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

৪র্থ পর্ব, ৪র্থ সংখ্যা

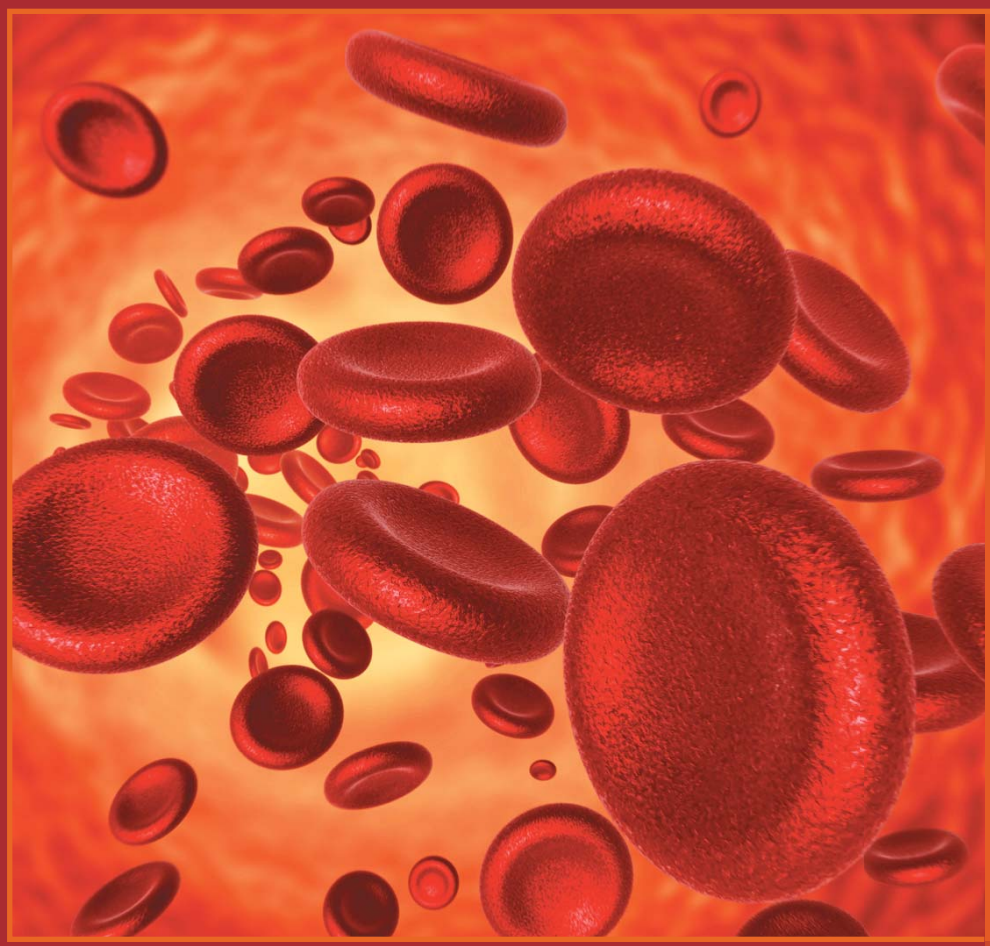

রক্তশূন্যতা

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ	৩
চমকপ্রদ তথ্য	৬
জনস্বাস্থ্য	৭
প্রশ্ন-উত্তর	১০
চিকিৎসা	১১
ইনফো কুইজ	১৪
স্বাস্থ্যকথা	১৫

সম্পাদক মণ্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ শায়লা শারমিন
ডাঃ মোঃ ইব্রাহীম রহমান
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক

প্রকাশনায়

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

ইনফো মেডিকাস একটি চিকিৎসা সাময়িকী যার উদ্দেশ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবন ও চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। আপনাদের সুবিধার্থে, আমরা আমাদের এই সংখ্যাটিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন কিছু তথ্য দিয়ে সাজিয়েছি।

রক্তশূন্যতা বা এনিমিয়া কোন অসুখ নয় বরং কোন একটি অসুখের পূর্ব লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে দেখা দেয় রক্তশূন্যতা। এটি একটি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সমস্যা, বিশেষ করে গর্ভবতী মায়ের অধিক মৃত্যুহারের অন্যতম কারণ হচ্ছে রক্তশূন্যতা, যা আমাদের দেশেও একটি মারাত্মক সমস্যা। তাই এবারের বিশেষ প্রবন্ধে রক্তশূন্যতার কারণ, লক্ষণ, করণীয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এবারের "চমকপ্রদ তথ্য" বিভাগটিতে হেপাটাইটিস ভাইরাস প্রতিরোধ এবং শিশুদের স্মরণশক্তি সম্পর্কে দুইটি চমৎকার তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চোখ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ। চোখকে কিভাবে নিরাপদ রাখতে হবে তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। অনেক সময় সচেতনতার অভাবে আমরা এর ক্ষতিসাধন করে ফেলি। এ কারণে সুস্থ থাকার জন্য চোখের যত্ন নেয়া খুবই জরুরী। তাই চোখের সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে "জনস্বাস্থ্য" বিভাগটিতে। পাশাপাশি নাকের ক্ষয়রোগ যা একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ; এর কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা নিয়েও এই বিভাগটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

এপেন্ডিসাইটিস একটি জরুরী অবস্থা যার চিকিৎসা যথাসময়ে করা না হলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে, যার কারণে রোগী অনেক সময় মারাও যায়। তাই চিকিৎসা বিভাগটিতে এপেন্ডিসাইটিস নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই বিভাগটিতে আরও আলোচনা করা হয়েছে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে, যা একটি মারাত্মক বংশগত রোগ। সাধারণত বাবা মায়ের জীনের ত্রুটির কারণে সন্তানের মধ্যে এ রোগটি হয়ে থাকে।

"স্বাস্থ্যকথা" বিভাগটিতে ২ মিনিটে হেঁচকি থামাবার সহজ উপায় সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়েছে।

সবশেষে এই সংখ্যাটির প্রতিটি বিভাগের তথ্যগুলো আপনাদের দৈনন্দিন চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করছি।

আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সবসময় সমর্থন করে আসার জন্য এ সি আই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

রক্তশূন্যতা

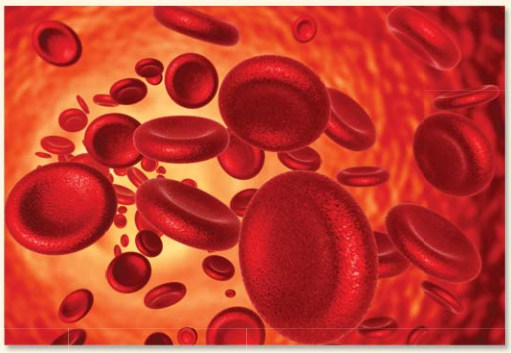

রক্তশূন্যতা বা এনিমিয়া কোনো রোগ নয়। এটি রোগের পূর্ব লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী রক্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ হিমোগ্লোবিন এর চেয়ে কম হিমোগ্লোবিন থাকার অবস্থাকে রক্তশূন্যতা বা এনিমিয়া বলে। রক্তশূন্যতা মানে রক্ত কমে যাওয়া নয় বরং রক্তের উপাদান লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলেই রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়ের অধিক মৃত্যুহারের অন্যতম কারণ হচ্ছে এই রক্তশূন্যতা। এটি একটি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সমস্যা। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগ লোক জীবনের কোনো না কোনো সময়ে রক্তশূন্যতায় ভুগে থাকেন। এই স্বাস্থ্য সমস্যাটি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায়। রক্তশূন্যতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। সেগুলোর মধ্যে দেহে আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতা, থ্যালাসেমিয়া, এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, ব্লাডক্যান্সার বা লিউকেমিয়া হতে পারে।

হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক পরিমাণ

বিভিন্ন বয়সের মানুষের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বিভিন্ন রকম। নিম্নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সের জন্য রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ দেয়া হলো -

বয়স	হিমোগ্লোবিনের মাত্রা (গ্রাম/ডেসিলিটার)
৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়স	১১
৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়স	১২
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১৩
প্রাপ্তবয়স্ক নারী	১২
গর্ভবতী নারী	১১

কারণ

বহুবিধ কারণে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। এগুলোর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো -

অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা কম তৈরি হওয়া। এর কারণগুলো হলো

- অস্থিমজ্জার স্বল্পতা
- আয়রন, ভিটামিন বি$_{১২}$ অথবা ফলিক এসিডের অভাব (মাসিক, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, দীর্ঘদিন রক্তক্ষরণ)
- দীর্ঘস্থায়ী জীবাণু সংক্রমণ, থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখ বা লিভারের অসুখ, বিভিন্ন প্রকার ওষুধ সেবন, কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার, রঞ্জন রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব ইত্যাদি

অতিরিক্ত পরিমাণে লোহিত কণিকা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ হলো

- জন্মগতভাবে লোহিত কণিকাতে ত্রুটি যেমনঃ থ্যালাসেমিয়া

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এর কারণগুলো হলো

- সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষরণ যেমন আঘাতজনিত
- পেপটিক আলসার, পাইলস, বক্র কৃমির সংক্রমণ, ঘন ঘন গর্ভধারণ ও প্রসব, মহিলাদের মাসিকের সময় অধিক রক্তক্ষরণ ইত্যাদি

এছাড়া এ রোগের ঝুঁকিতে আছেন যারা তারা হলেন

- যেসব মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একই রোগে ভুগছেন
- যেসব গর্ভধারণক্ষম মহিলার ঋতুস্রাবকালীন সময়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়
- গর্ভবতী মহিলা
- যারা কিডনির রোগে ভুগছেন
- যারা লৌহ, ফলেট ও ভিটামিন বি$_{১২}$ সমৃদ্ধ খাবার কম খান
- কিশোর বয়সের ছেলে মেয়ে

লক্ষণ

সামান্য পরিমাণ রক্তশূন্যতায় তেমন কোনো উপসর্গ দেখা দেয় না। রক্তশূন্যতা প্রকট হলে যেসব উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে -

অতিরিক্ত ক্লান্তি

হিমোগ্লোবিন রক্তে অক্সিজেন পৌঁছে দেয় তাই এর অভাবে মানুষের সাধারণ কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

স্বাভাবিকের চেয়ে কম কাজ করার ফলেই শরীর অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করে। রোগী দূর্বল ও খিটখিটে মেজাজের হয়ে কাজে মনোযোগ দিতে পারে না।

ত্বক ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া

হিমোগ্লোবিনের ফলে রক্তের রং লাল হয়। এর অভাবের ফলে রক্তের লাল ভাব কমে গিয়ে ত্বক ফ্যাকাসে হয়ে যায়। হাতের তালু, ঠোঁট, মাড়ি এবং নিচের চোখের পাতার ভেতরে স্বাভাবিকের তুলনায় কম লাল হয়।

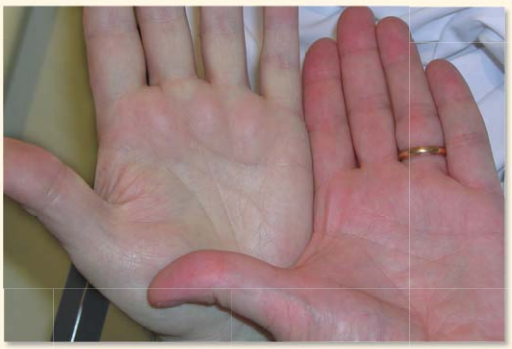

স্নায়বিক অস্থিরতা

মস্তিষ্কে অক্সিজেন কম পৌঁছালে মানুষ সহজেই অস্থির বোধ করে। ধৈর্য ধারন ক্ষমতা কমে যায়।

দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস ও সংক্ষিপ্ত দম

রক্তে অক্সিজেন কম পৌঁছানোর ফলে মানুষ স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, দম ধরে রাখতে পারে না, হার্ট বিট দ্রুত হয় এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠতে প্রচন্ড সমস্যা হয়। এতে শরীর ক্লান্ত ও হাঁসফাঁস লাগে।

চোখে ঝাপসা লাগা

আয়রনের অভাবের ফলে চোখে ঝাপসা লাগতে পারে।

মাথা ঝিমঝিম ও ব্যাথা করা

আয়রনের অভাবের ফলে মাথা ঝিমঝিম করতে পারে অথবা মাথা ব্যথা হতে পারে।

অতিরিক্ত চুল পড়া

দিনে যদি ১০০ টার মত চুল পড়ে তাহলে চিন্তার কিছু নেই কিন্তু প্রতিদিন যদি এর অনেক বেশি চুল পড়ে তাহলে ধরে নিতে হবে আয়রনের অভাবের ফলে চুল পড়ে যাচ্ছে।

কাদামাটি, ময়লা এবং বরফ খাওয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা

আয়রনের অভাবে রোগীদের অখাদ্য বস্তু খাওয়ার প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। অনেক সময় কাদামাটি বা লোহা খেতে ইচ্ছা করে। নারীদের বরফের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়।

থাইরয়েড সমস্যা

আয়রনের অভাবে থাইরয়েডের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। যার ফলে পরিশ্রমের ক্ষমতা দিন দিন কমে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে, ওজন বেড়ে যেতে পারে এবং শরীর ব্যাথা হতে পারে।

জিহ্বার অদ্ভুত রং ও আকার

আয়রনের অভাবে জিহ্বা ফ্যাকাসে হয়ে মাঝে মাঝে কালশিটে পরে, দানা উঠে। আকারে পরিবর্তন হয়। কখনো অতিরিক্ত মসৃণ হয়ে যায়।

হজমে সমস্যা

আয়রনের অভাবে হজমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। যার ফলে শরীর সঠিক পুষ্টি পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা হতে পারে।

রক্তশূন্যতায় করণীয়

খাবারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়রনের যোগান না পেলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। প্রাণীজ খাবারের তুলনায় উদ্ভিজ খাবার থেকে মানবদেহ আয়রনের যোগান কম পায়, তাই প্রাণীর কলিজা এবং লাল মাংস বা এ ধরনের আয়রন সমৃদ্ধ প্রাণীজ খাবার না খেলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে।

- দীর্ঘমেয়াদী রোগ, প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণে অনিহা কিংবা হজমে সমস্যা এবং পাকস্থলীর বাইপাস অপারেশন এর ফলে পাকস্থলির খাবার থেকে আয়রন শোষণের ক্ষমতা কমে যেতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে
- কিছু কিছু ওষুধ এবং খাবার মানুষের পাকস্থলিতে আয়রন শোষণের মাত্রা কমিয়ে দেয়। এসব খাবার ও ওষুধের মধ্যে আছে - দুগ্ধজাতীয় খাবার, এন্টাসিড ওষুধ, চা ও কফি। সুতরাং আয়রন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের পূর্বে ও পরে এগুলো গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে

- খাবারে ফলেট ও ভিটামিন বি$_{১২}$ এর পরিমান কম থাকলে এসবের অভাবে শরীরে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন কমে যেতে পারে যা হতে পারে রক্তশূন্যতার কারণ। প্রাণীজ আমিষ যেমন কলিজা, মাংস ইত্যাদিতে প্রচুর ভিটামিন বি$_{১২}$ আছে যা মানব দেহ সহজে গ্রহণ করে। এছাড়া সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, শিমের বিচি, ছোলা, ডাল ইত্যাদিতে প্রচুর ফলেট রয়েছে। সুতরাং এসব খাবার সঠিক মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে
- ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগলে শরীরে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন কমে যেতে পারে, তাই এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ সেবন করতে হবে
- এপ্লাস্টিক এনেমিয়া একটি রোগ যাতে মানুষের অস্থিমজ্জা হতে রক্ত কনিকা উৎপাদনের মাত্রা কমে যায়। সাধারণত ক্যান্সার এর চিকিৎসা (যেমন কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি) গ্রহণকালীন সময়ে কিংবা ভাইরাসের সংক্রমণে এমনটি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক রক্ত ও ওষুধ গ্রহণ করতে হবে
- মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রক্তশূন্যতা হতে পারে। যেসব কারণে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে সেগুলো হল - অপারেশন, দূর্ঘটনা জনিত জখম, ঋতুস্রাব কালিন অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ ইত্যাদি
- থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর দেহে রক্তকণিকার উৎপাদন কম হয় তাই এ রোগে আক্রান্তদের নিয়মিত রক্ত গ্রহণ করতে হয়

পরীক্ষা

রক্তশূন্যতার কারণ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা করা যেতে পারে। যেমনঃ

- রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা
- পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম
- অস্থিমজ্জা পরীক্ষা
- মাথার এক্স-রে (থ্যালাসেমিয়া)
- প্রয়োজন ভেদে কিছু বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসা

- আয়রনের অভাবজনিত কারণে রক্তশূন্যতা দেখা দিলে (যেমনঃ খাদ্যে ঘাটতি, কৃমির সংক্রামক, পেপটিক আলসার এর রক্তক্ষরণ ইত্যাদি) রোগীকে আয়রন ট্যাবলেট দিতে হবে
- ভিটামিন বি$_{১২}$ বা ফলিক এসিড এর অভাব হলে উক্ত উপাদানের ঘাটতি পূরণ করতে হবে। যে কোনো কারণেই হোক যদি রক্তশূন্যতা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দেয় তবে অল্প সময়ে সাময়িক উন্নতির জন্য রক্ত পরিসঞ্চালন করা জরুরি হয়ে পড়ে এবং এজন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রয়োজন হয়। গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা এবং শিশুদের অধিকাংশই সাধারণ রক্তশূন্যতার শিকার। রক্তশূন্যতা রোধে গর্ভবতী মা, শিশুদের আয়রনসমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে দিতে হবে। কালো কচু, ধনেপাতা, ডাঁটা শাক, আমচুর, পাকা তেঁতুল, ছোলা শাক, ফুলকপি, আটা, কালোজাম, চিড়া, শালগম, কলিজা, চিংড়ি এবং শুটকি মাছেও আয়রন রয়েছে। তাই এগুলো মা ও শিশুকে খেতে দিতে হবে
- গর্ভবতী মাকে গর্ভের চতুর্থ মাস থেকে আয়রন ট্যাবলেট খেতে দিতে হবে। শিশুর কৃমি রক্তশূন্যতার অন্যতম কারণ। তাই কৃমি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে হবে

প্রতিরোধ

- ছয় মাসের কম বয়সী শিশুকে অবশ্যই মায়ের দুধ পান করাতে হবে
- ছয় মাসের পর থেকে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি খিচুড়ি, শাকসবজি, মাছ, কলা ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করাতে হবে
- দুই বছরের অধিক বয়সী পরিবারের সবাইকে কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে
- ঘনিষ্ঠ বা নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ না করার জন্য উৎসাহী করতে হবে। নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে না হলে লোহিত রক্তকণিকার সমস্যাজনিত রক্তশূন্যতা অনেক ক্ষেত্রেই এড়ানো সম্ভব
- যেসব অসুখে ক্রনিক রক্তক্ষরণ হয়, যেমনঃ পেপটিক আলসার, হেমোরয়েড বা পাইলসের চিকিৎসা নেওয়া ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মহিলা, গর্ভবতী মহিলা প্রত্যেকের নিয়মিত আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড সেবন করতে হবে

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

চমকপ্রদ তথ্য

হেপাটাইটিস ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা জরুরী

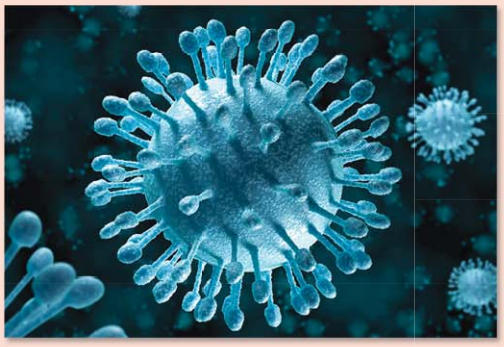

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষ হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাসে আক্রান্ত। এদের মধ্যে প্রায় ১৪ লাখ মানুষ প্রতি বছর আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। কিন্তু সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষেধক সুবিধা বাড়ানো গেলে এই ভাইরাস প্রতিরোধ সম্ভব। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে "হেপাটাইটিস প্রতিরোধ নির্ভর করছে আপনার ওপর" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। যারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন তাদের অনেকেই জানেনা তারা এই রোগ বহন করছেন।

বাংলাদেশে প্রায় এক থেকে দেড় কোটি মানুষ হেপাটাইটিস ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি বাহক বলে অভিমত বিশেষজ্ঞদের। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ নানা ধরনের লিভার রোগে আক্রান্ত। লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের জন্য প্রধানত দায়ী হেপাটাইটিস। যদিও এ নিয়ে তেমনভাবে গবেষণার কাজ হয়নি বলে সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায়নি, তবু বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় চার থেকে পাঁচ শতাংশ রোগী হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে আক্রান্ত।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

মিথ্যাবাদী শিশুদের স্মরণশক্তি সবচেয়ে ভালো

ভালো স্মরণশক্তির অধিকারী শিশুরা সবচেয়ে ভালোভাবে মিথ্যা বলতে পারে বলে মনোবিজ্ঞান গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন। মনোবিজ্ঞানীরা ছয় আর সাত বছর বয়সী কিছু শিশুকে একটি খুব সাধারণ খেলায় কারসাজি করার সুয়োগ দিয়ে তা নিয়ে মিথ্যা বলার অনুমতি দেন। পরে দেখা গেল যেসব শিশু খুব ভালো মিথ্যাবাদী, তারা স্মরণশক্তির পরীক্ষায় ভালো করেছে। এর মানে হলো, তারা অনেক পরিমান তথ্য নাড়াচাড়ায় দক্ষ। নর্থ ফ্লোরিডা, শেফিল্ড এবং স্টারলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাদের গবেষণার জন্যে চারটি ব্রিটিশ স্কুল থেকে ১১৪ জন শিশুকে বাছাই করেছিলেন। প্রশ্নোত্তরের একটি খেলায় লুকানো ক্যামেরায় তাঁরা খুব সহজেই ঐসব শিশুকে চিহ্নিত করেন যারা দেখে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল, যদিও তাদের বলা হয়েছিল না দেখার জন্যে। আশ্চর্যজনক একটি তথ্য হলো, মাত্র এক চতুর্থাংশ শিশু উত্তর দেখার প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল। এরপর আরো প্রশ্ন করে গবেষকরা জানতে পারেন কে বেশী মিথ্যাবাদী, আর কে কম মিথ্যাবাদী। গবেষকরা বিশেষভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, কারা ভালোভাবে মিথ্যা ঢাকতে সমর্থ। আর যারা ভালো মিথ্যাবাদী, শব্দের ব্যাপারে তাদের ভালো স্মরণশক্তি রয়েছে, যদিও এমন কোন প্রমান পাওয়া যায়নি যে ছবি স্মরণ করার ব্যাপারেও তারা একই রকম দক্ষ। গবেষকের মতে, এটা এ কারণে যে মিথ্যা বলতে প্রচুর কথা মনে রাখতে হয়, ছবি খুব একটা মনে না রাখলেও চলে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

চোখের সমস্যা ও প্রতিকার

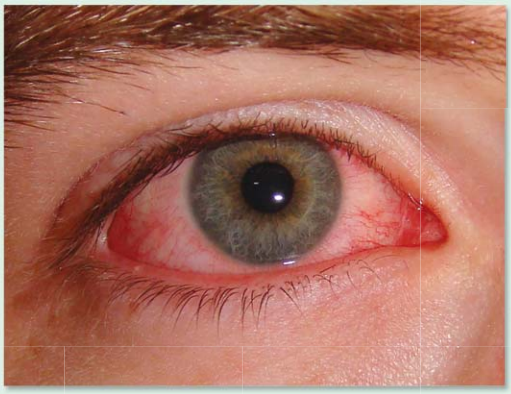

চোখ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই চোখকে কীভাবে নিরাপদ রাখতে হয় তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। আবার অনেকে জেনেও সচেতনতার অভাবে তা মানি না। সামান্য অবহেলা, অসাবধানতা, অজ্ঞতা ও সুচিকিৎসার অভাবে আমরা এই অমূল্য সম্পদ হারাতে পারি। চোখের সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হলো।

চোখ ওঠা

চোখের সাদা অংশ, যাকে কনজাংকটিভা বলে, এর প্রদাহকে বলে চোখ ওঠা বা কনজাংকটিভাইটিস। সাধারণত এক চোখে শুরু হয় রোগটি। পরে দুই চোখই আক্রান্ত হয়। চোখ ওঠা বা কনজাংকটিভাইটিস রোগ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অ্যালার্জিসহ বেশ কয়েকটি কারণে হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসজনিত কারণে হওয়া চোখ ওঠা রোগ খুবই ছোঁয়াচে।

কারণ

- ব্যাকটেরিয়া
- ভাইরাস
- এ্যালার্জি

লক্ষণ

কনজাংকটিভার সবরকম প্রদাহের ক্ষেত্রেই চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে ওঠে। অন্যান্য লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

ব্যাকটেরিয়া জনিত কনজাংকটিভার প্রদাহ

চোখ থেকে পুজের মতো ঘন পদার্থ নিসৃত হয় এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর চোখের পাপড়িগুলো শক্ত এবং জড়সড় হয়ে ওঠে।

ভাইরাস জনিত কনজাংকটিভার প্রদাহ

- চোখ থেকে পানির মতো ঘন পদার্থ বের হওয়া, প্রায়শই যেকোন একটি চোখ থেকে এই নিঃসরণ ঘটা
- মাঝে মধ্যে চোখের পাতা যুক্ত হয়ে যাওয়া

এ্যালার্জি জনিত কনজাংকটিভার প্রদাহ

- চোখের চারপাশের ত্বকগুলো ফুলে ওঠে
- চোখে চুলকানির মতো হয়
- চোখে জ্বলা পোড়া হয় এবং পানি পড়তে থাকে
- নাক দিয়ে পানি পড়া এবং হাঁচি হওয়া

পরিবেশজনিত কনজাংকটিভার প্রদাহ

- চোখের ভেতর কিছু ঢুকেছে বলে মনে হওয়া
- চোখে জ্বালা পোড়া হওয়া এবং পানি পড়তে থাকা

চিকিৎসা

কনজাংকটিভার প্রদাহ হলে ধূলোবালি থেকে দূরে থাকতে হবে। চোখে কালো চশমা পরতে হবে। চোখে চুলকানির জন্য এন্টিহিস্টামিন খেতে হবে। কনজাংকটিভার প্রদাহ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হলে এন্টিবায়োটিক খেতে হবে। কনজাংকটিভার প্রদাহ এ্যালার্জির দ্বারা হলে টপিকাল করটিকোস্টেরয়েড দিতে হবে।

প্রতিরোধ

সরাসরি হাতের স্পর্শ, ফোমাইট, বাতাস, এমনকি হাত মুখ ধোয়া ও অজু গোসলের সময় পুকুর, নদী বা সুইমিংপুলের পানির মাধ্যমেও জীবাণুগুলো ছড়াতে পারে। কনজাংকটিভাইটিসে আক্রান্ত চোখে আঙুল বা হাত লাগালে হাতে লেগে থাকা জীবাণু রুমাল, তোয়ালে, গামছা, টিস্যু পেপার, কলম, পেনসিল, বইয়ের পাতা, খাতা, টেবিল, চেয়ার, দরজার সিটকিনি, কলের ট্যাপ ইত্যাদিতে লেগে থাকতে পারে। এগুলোকে তখন চিকিৎসার পরিভাষায় বলে ফোমাইট। রুমাল, তোয়ালে, গামছা, টিস্যু পেপার দিয়ে আক্রান্ত চোখ মুছলেও এগুলোতে জীবাণু লেগে থাকবে। এসব ফোমাইটের মাধ্যমেও জীবাণু ছড়িয়ে যেতে পারে অন্যের চোখে।

চোখের ছানি

চোখের লেন্স বা এর আবরণ (ক্যাপসুল) ঘোলা হয়ে যাওয়াকেই বলা হয় ছানি বা কেটারেক্ট। আমাদের দেশে অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে চোখের ছানি।

কারণ

- বার্ধক্য জনিত
- আঘাত জনিত

- ডায়াবেটিস জনিত
- চোখের বিভিন্ন প্রদাহ ও অসুখ
- গর্ভাবস্থায় মায়ের রুবেলা বা অন্য কোনো জীবাণুর প্রদাহ

লক্ষণ

ছানির প্রথম অবস্থায় লেন্সের কিছু অংশ ঘোলাটে হয় এবং খুব ধীরে ধীরে দৃষ্টির প্রখরতা কমতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় চশমার পাওয়ার পরিবর্তন করলে দৃষ্টির প্রখরতা বাড়ানো সম্ভব। তবে ক্রমে ক্রমে লেন্স আরও ঘোলাটে হতে থাকে এবং ২-৩ বছরের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ লেন্সই ঘোলা হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ এ অবস্থাকে ছানি পাকা বলে অভিহিত করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ম্যাচিওর ক্যাটারেক্ট। সাধারণত ৬০ থেকে ৮০ বছর বয়সের মধ্যে এ ধরনের ছানি পড়তে দেখা যায়। অবশ্য অনেকের বংশগত কারণে এ বয়সের আগে বা পরে ছানি পড়তে পারে। এই বয়সজনিত ছানিকে বলা হয় সেনাইল ক্যাটারেক্ট।

ডায়াবেটিস জনিত চোখের ছানি

ডায়াবেটিসে সন্দেহাতীতভাবে ছানি পড়ার ঝুঁকি খুব বেশি। ফ্রামিংহাম আই স্টাডি নামের একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, নন ডায়াবেটিকের তুলনায় ডায়াবেটিক রোগীদের ৪০-৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ছানি হওয়ার হার কিছুটা বেশি। কিন্তু ৫০-৬০ বছরে এই হার ২-৩ গুণ বেশি। আবার ৬৯ বছর বয়সের পর ডায়াবেটিক ও নন ডায়াবেটিক রোগীদের ছানি হওয়ার হার সমান সমান।

সুতরাং এ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ডায়াবেটিক রোগীদের বেলায় ৬৯ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত বয়সজনিত ছানি তুলনামূলকভাবে দ্রুত শুরু হয় এবং তাদের চিকিৎসা বা ছানি অপারেশন তুলনামূলক কম বয়সে সম্পন্ন করা প্রয়োজন হয়।

কিন্তু অল্প বয়স্ক জুভেনাইল ডায়াবেটিকদের চোখে এক ধরনের ছানি দেখা যায়, যা দেখতে সাদা ফোঁটা ফোঁটা হতে পারে বা সাদা ফোঁটা ও দাগের মতো দেখা যায়। স্লিট ল্যাম্প যন্ত্রের সাহায্যে এই ছানিকে তুষারকণার মতো মনে হয়। অনেকের চোখে আবার সূক্ষ্ম সূঁচের মতো ঘোলা দাগ দেখা যায়।

এই দুই ধরনের ছানিকে বলা হয় মূল ডায়াবেটিক ছানি। মূল ডায়াবেটিক ছানি সাধারণত জুভেনাইল ডায়াবেটিক, যাদের রক্তের শর্করা খুবই উঁচু মাত্রায় থাকে এবং অনিয়ন্ত্রিত বিপাক প্রক্রিয়া বিদ্যমান, তাদের বেলাতেই বেশি দেখা যায়।

এ কারণে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এবং উন্নয়নশীল দেশে মূল ডায়াবেটিক ছানি বেশি দেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এই ছানি ধরা পড়লে এবং ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করলে ঘোলা লেন্সের দাগ আবার পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ এই ছানিকে প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করালে আগের অবস্থায় ফেরানো সম্ভব হয়।

চিকিৎসা

ছানির প্রাথমিক অবস্থায় চশমার সাহায্যে দৃষ্টির প্রখরতা বাড়ানো গেলেও আস্তে আস্তে রোগী যখন তার স্বাভাবিক কাজকর্মে অসুবিধা অনুভব করেন, তখনই ছানির একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন করতে হবে।

আমাদের দেশে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, রোগীর ছানি সম্পূর্ণ না পাকলে তা অপারেশনের যোগ্য হয় না। এই ধারণাটি একেবারেই ঠিক নয়। বরং বেশি পেকে গেলেই চোখের অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে এবং পরে অপারেশন করেও আশানুরূপ দৃষ্টি ফিরে নাও আসতে পারে।

রাতকানা

রাতকানা হচ্ছে রাতে স্বল্পআলোয় দেখার অক্ষমতা। সাধারণত ভিটামিন-এ এর অভাবে এ রোগ হয়ে থাকে। রাতকানায় আক্রান্ত ব্যক্তি দিনের বেলায় ভালোভাবে দেখতে পারে, কিন্তু রাতে অথবা অন্ধকার ঘরে অল্প আলোতে ঠিকমত দেখতে পায় না।

কারণ

- ভিটামিন-এর অভাব
- শিশুকে মায়ের দুধ না খাওয়ানো
- বাড়তি খাবারে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাদ্য কম বা না থাকলে
- শিশুর স্বাভাবিক খাবারে ভিটামিন-এ জাতীয় খাদ্য কম থাকলে কিংবা ডায়রিয়া বা হাম হলে

লক্ষণ

- চোখের সাদা অংশের রং পরিবর্তন হয়ে বাদামি হয়ে যায়
- চোখের পানি কমে গিয়ে সাদা অংশ শুষ্ক হয়ে যায়
- চোখ লাল হয়ে যায়
- অল্প আলোতে চোখে ঝাপসা বা কম দেখে
- উজ্জ্বল আলোর দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না
- চোখে ফুলি পড়ে (বিটট স্পট)
- চোখের মণিতে ঘা হয়ে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়

প্রতিকার

- এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদেরকে প্রতি বছরে ৬ মাস অন্তর অন্তর ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো

- প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন- কলিজা, মাছের তেল, ডিম, মাখন এবং গাঢ় রঙ্গিন শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়া
- শাক সবজি রান্নায় অবশ্যই পরিমিত তেল ব্যবহার করা
- শালদুধ সহ যতদিন সম্ভব বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো
- লক্ষণ দেখা গেলেই চিকিৎসা করা

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

নাকের ক্ষয়রোগ

নাকের ক্ষয়রোগ একটি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়রোগ, যাতে নাকের ঝিল্লি ও ঝিল্লির নিচের অংশ বা তার আশপাশের হাড় ক্ষয় হয়ে যায়। এটি একটি বিশেষ ধরণের রোগ যা অনেক বিলম্বে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এ রোগটি সাধারণত মহিলাদের বেশি হয়ে থাকে।

কারণ

বিভিন্ন কারণে নাকের ক্ষয়রোগ হয়ে থাকে। যেমনঃ

- বংশগত
- পুষ্টিহীনতা
- নাক ও সাইনাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ
- রক্তনালির প্রদাহ
- হরমোনজনিত
- নাকের হাড়ের অসামঞ্জস্যতা
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে

লক্ষণ

- নাক দিয়ে দূর্গন্ধ বের হয়, যা রোগী নিজে বুঝতে পারে না। কিন্তু তার আশপাশের লোকজন বুঝতে পারে
- নাক বন্ধ থাকে, যা নাকের একদিকে বা দুদিকেই হতে পারে
- এক ধরনের সবুজ, দূর্গন্ধযুক্ত রস নিঃসরণ করে
- মাঝেমধ্যে নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে
- মাথাব্যাথা, নাক ও গলা শুষ্ক হয়ে যেতে পারে
- নাকের পরীক্ষায় দেখা যায়, নাকের গহবর বেশ বড় এবং নাকের ভেতর সবুজ আস্তরণ বা অনেক ক্রাস্টে পরিপূর্ণ। এ ছাড়া নাকের আশপাশের মাংসগুলো শুকিয়ে ছোট বা ক্ষয় হয়ে যায়।

পরীক্ষা

- নাক ও সাইনাসের এক্সরে
- রক্তের রুটিন পরীক্ষা, ভিডিআরএল, টিপিএইচএ, রক্তের গ্লুকোজ
- এইচআইভি পরীক্ষা
- নাক ও সাইনাসের সিটিস্ক্যান
- নাকের নিঃসৃত রসের কালচার ও সেনসিটিভিটি পরীক্ষা

চিকিৎসা

প্রধানত ওষুধের মাধ্যমেই চিকিৎসা করা হয়, মাঝে মধ্যে এ রোগের জন্য অপারেশনেরও প্রয়োজন হতে পারে। যদি তা ওষুধের মাধ্যমে না সারে। গ্লিসারিনের সঙ্গে শতকরা ২৫ ভাগ গ্লুকোজের মিশ্রণ প্রতিদিন ৪ ফোঁটা করে ২ নাকের ছিদ্রে দিনে ৩-৪ বার করে দীর্ঘমেয়াদি দেয়া হয়। অ্যালকালাইন দ্রবণ দিয়ে নাকের গহবর নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন হতে পারে যখন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। এছাড়া পরিপূরক হিসেবে ভিটামিন দেয়া যেতে পারে।

রোগের পরিণতি

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ, যা পুরোপুরি সারে না, রোগী মানসিক হতাশায় ভোগে। এ জন্য রোগীকে এ রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বোঝাতে হবে। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং রোগী স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হলো গ্লিসারিনের শতকরা ২৫ ভাগ গ্লুকোজ সারা বছর ব্যবহার করা, এতে রোগটি নিয়ন্ত্রণে থাকে। একজন নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞের অধীনে নিয়মিত চেকআপে থাকলে ভাল হয়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্নঃ ভাত খাওয়া ভালো নাকি রুটি খাওয়া ভালো?

উত্তরঃ খাদ্যগুণ বিচার করতে গেলে একদিক থেকে ভাতের চেয়ে আটার রুটি বেশি ভালো। কারণ রুটি অনেক বেশি তাপশক্তি বা ক্যালরি উৎপাদনে সক্ষম। যেমন, আধা ছটাক চাল থেকে পাওয়া যায় ১০২.১ ক্যালরি আর আধা ছটাক আটা থেকে পাওয়া যায় ৯৬.৪ ক্যালরি। কিন্তু যখনই রান্না হয়, তখন দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। চাল থেকে যখন ভাত তৈরি হলো তখন চালের ক্যালরি ১০২.১ থেকে নেমে দাঁড়ায় ৫৬.৭। অথচ আটার ক্যালরি ৯৬.৪ রুটি হয়ে দাঁড়ায় ১০১.২। সাদা ধবধবে চালের প্রতি মানুষের দূর্বলতা রয়েছে। কিন্তু ওই বেশি ছাঁটা চালে ভিটামিন কম থাকে। আবার যখন ভাতের মাড় বা ফ্যান ফেলে দিয়ে রান্না করা হয় তখন বাদ পড়ে যায় প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের বড় একটা অংশ। গমের তুষের ক্ষেত্রেও একই ভুল করা হয়। আটা চেলে নিয়ে রুটি বানানো হয়। অথচ গমের তুষে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি, বা থায়ামিন থাকে।

সবদিক বিচার করে পুষ্টিবিদরা বলেছেন, প্রতিদিনই দুই ধরনের খাদ্যশস্য যেমন ভাত রুটি মিশিয়ে খাওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ভাত হলো কম ছাঁটা চালের আর রুটির ক্ষেত্রে তুষযুক্ত আটার রুটি।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

প্রশ্নঃ পানিতে বেশীক্ষণ হাত ডুবিয়ে রাখলে চামড়া কুঁচকে যায় কেন?

উত্তরঃ বেশীক্ষণ ধরে গোসল করলে কিংবা পানির কাজ করলে আঙুলের ডগার চামড়া কুঁচকে যায়। কিন্তু এই চামড়া কুঁচকে যাওয়ার মূল কারণ আমরা অনেকেই জানি না। আমাদের দেহের চামড়া বেশ কয়টি স্তর দিয়ে তৈরি। আমাদের চামড়ার সব থেকে বাহিরের স্তরটির নাম এপিডারমিস। এই এপিডারমিস থেকে এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ নির্গত হয় যার নাম সেবাম। এই সেবাম আমাদের চামড়ার জন্য একটি প্রতিরক্ষা পর্দার মতো তৈরি করে।

আমরা যখন কাঁচ কিংবা অন্যান্য মসৃণ কোনো তল স্পর্শ করি তখন আমাদের হাতের ছাপ বসে যায় সেখানে, আমাদের হাত পরিস্কার থাকলেও এটি হয়ে থাকে। এই তৈলাক্ত ছাপই সেবাম। সেবামের কারণেই এই কাজটি হয়ে থাকে। যখন আমরা কিছু সময় পানি ধরি বা পানির সংস্পর্শে থাকি তখন এই সেবামের কারণে পানি আমাদের চামড়ার ভেতরের স্তরে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু বেশি সময় ধরে পানি ধরলে আমাদের হাতের এই সেবাম চলে যায় এবং চামড়ার ভিতরে পানি প্রবেশ করে।

অর্থাৎ আমাদের চামড়া পানি শোষণ করে এবং এপিডারমিসের ভেতরের স্তর ডারমিসে প্রবেশ করে। তখন যে যে স্থানগুলোতে ডারমিস ও এপিডারমিসের মধ্যকার বন্ধন থাকে না সেসব স্থান পানি শোষণ করে ফুলে যায় এবং যে যে স্থানগুলোতে ডারমিস ও এপিডারমিসের মধ্যকার বন্ধন থাকে সেসব স্থান আগের মতোই থাকে তাই আমাদের কাছে চামড়া কুঁচকে

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

এপেন্ডিসাইটিস

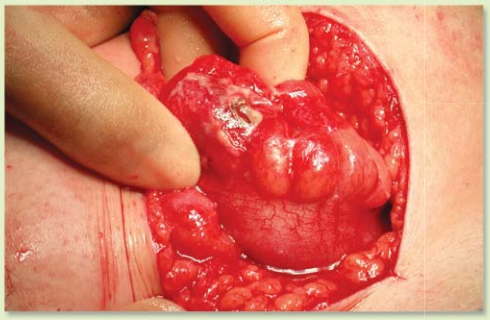

আমাদের বৃহদন্ত্র নলের মতো ফাঁপা। বৃহদন্ত্রের তিনটি অংশের মধ্যে প্রথম অংশ হচ্ছে সিকাম। এই সিকামের সঙ্গে ছোট একটি আঙ্গুলের মতো মাংসের বৃদ্ধি হল এপেনডিক্স। এপেনডিক্সের প্রদাহ হলে তখন তাকে এপেন্ডিসাইটিস বলে। এটি একটি সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সী। সংক্রমণের কারণে এপেন্ডিক্সে প্রদাহ হয়, যাতে এপেন্ডিক্স ফুলে ওঠে এবং ব্যথার জন্ম দেয়। এপেন্ডিসাইটিস এর চিকিৎসা নেওয়া জরুরী, কেননা এর একটি জটিলতা হচ্ছে পারফোরেশন বা ফেটে যাওয়া যাকে বার্স্ট এপেনডিক্স বলে। যদি একটি সংক্রমিত এপেনডিক্স ফেটে যায়, সেক্ষেত্রে সারা পেট জুড়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পেরিটোনাইটিসের মত পেটের পর্দার মারাত্মক সংক্রমণ হতে পারে। যদি দ্রুততার সাথে চিকিৎসা করা না হয়, পেরিটোনাইটিসের কারণে মৃত্যুও হতে পারে। ফেটে যাওয়ার ঝুঁকি আছে বলেই, এপেন্ডিসাইটিসকে একটি জরুরী অবস্থা হিসেবে ধরা হয়।

কারণ

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মলের টুকরা আটকে এপেন্ডিক্সের খোলা মুখ বন্ধ হয়ে গেলে, প্রদাহ শুরু হয়। পরিপাকতন্ত্রে কোন সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ার কারণেও এটা হতে পারে। কোনো কারণে যদি এর মধ্যে পচিত খাদ্য, মল বা কৃমি ঢুকে যায়, তাহলে শরীরে রক্ত ও পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। নানান জীবাণুর আক্রমণে এপেন্ডিক্সের ঐ অংশে বিভিন্ন উপসর্গও দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ

- প্রথমে ব্যাথা নাভির চারপাশ থেকে শুরু হয়ে পরে তলপেটের একটু ডান দিকে গিয়ে স্থির হয়। সময়ের সঙ্গে ব্যথার পরিমাণ বাড়তে থাকে
- তলপেটে হাত দিলেই রোগী ব্যথা অনুভব করে
- বার বার বমি ভাব হয়, কারো ক্ষেত্রে বমি হতে পারে
- জ্বর আসতে পারে
- এপেন্ডিক্সটি অনেক সময় ফেটে ফ্লুইড পেটের ভেতরে অন্যান্য ফাঁকা স্থানে (abdominal cavity) ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে সাময়িক ভালোলাগা কাজ করে। বেশি সময় অতিবাহিত হলে অবস্থা আগের থেকে খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, পেরিটোনাইটিসের উপসর্গগুলো আরও অনেক মারাত্মক। ব্যথার পরিমাণ অনেক বেশি থাকে এবং সারা পেট জুড়ে থাকে। পেট ফুলে যায় এবং পেট শক্ত হয়ে যায় ও চাপ অনুভূত হয়।

ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস

- অগ্ন্যাশয়ে তীব্র প্রদাহ
- অন্ত্রের প্রদাহ
- পিত্তথলির তীব্র প্রদাহ
- ডান পাশের কিডনী পাথরের শূলবেদনা
- ডিম্বাশয়ে সিস্ট
- উভয় ফেলোপিয়ান টিউব ও ডিম্বাশয়ে প্রদাহ
- জরায়ুর বাইরের গর্ভ ফেটে গেলে
- মাসিকের সময় ডিম্ব ফলিকল ভাঙ্গন

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

এপেন্ডিসাইটিসের বাহ্যিক লক্ষণ

স্পর্শকাতরতা এবং প্রতিক্ষেপণ স্পর্শকাতরতাঃ এটি ম্যাক বার্ণিস বিন্দুতে উপস্থিত থাকে। প্রতিক্ষেপণ স্পর্শকাতরতা উদরের আবরকঝিল্লী আংশিক প্রদাহের কারণে হয়

কপ'স সোয়াস পরীক্ষাঃ সোয়াস মেজর পেশির উত্তেজনায় কোমরে ভাঁজ এবং চিকিৎসা আবর্তন ব্যথা ঘটায়

কপ'স অবটুরেটর পরীক্ষাঃ অবটুরেটর পেশী উত্তেজনা হয়, ভাঁজ এবং চিকিৎসা আবর্তন ব্যথা ঘটায়

মাঝে মাঝে এপেন্ডিসাইটিস রোগ নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, বিশেষ করে ছোট শিশু, বয়স্ক লোক এবং গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে। রোগের উপসর্গ পর্যালোচনা

করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। সাধারণত নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলো করা হয়ে থাকেঃ

- রক্তের পরীক্ষা Complete blood count (CBC)
- প্রস্রাবের পরীক্ষা Urine RME
- বুকের এক্সরে Chest X-Ray
- পেটের Ultrasonogram (USG)
- পেটের CT scan

চিকিৎসা

এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন। কোনো ওষুধে বা এ্যান্টিবায়োটিকে এ রোগ সারে না। এপেন্ডিসাইটিসের সমস্যা দেখা দিলে অপারেশন ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই করতে হয়। যদি রোগ নির্ণয় অস্পষ্ট হয়, তাহলে হাসপাতালে ভর্তি করে ১২-২৪ ঘণ্টার জন্য রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে, এটা জানার জন্য যে অপারেশন লাগবে কিনা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশনের মাধ্যমে এপেন্ডিক্স ফেলে দিতে হয়। অপারেশনের নাম হচ্ছে এপেন্ডিসেকটোমি। দুই ধরনের অপারেশন আছে - পেট কেটে অথবা ল্যাপারোস্কোপ দিয়ে। ল্যাপারোস্কোপি এর ক্ষেত্রে পেটের নিচের অংশে তিনটি ছোট ছিদ্র করে অপারেশন করা হয়। জটিলতাপূর্ণ রোগীদের ক্ষেত্রে তলপেট কেটে এই অপারেশন করা হয়। পেরিটোনাইটিস হলেও অপারেশন-ই এর চিকিৎসা এবং এই অবস্থাকে সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সী হিসাবে গণ্য করা হয়। পেরিটোনাইটিসের উপসর্গ সম্বলিত রোগীকে ইমার্জেন্সী বিভাগে যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষা করা উচিত। সার্জারির আগে রোগীকে এ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে। রোগীর এপেনডিক্স ফেটে গিয়ে পেরিটোনাইটিস হয়েছে কি না তার উপর ভিত্তি করে এ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা ২৪ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় ধরে চলতে পারে।

অপারেশন পরবর্তী প্রথম দিনে রোগীকে হয়তো কোন খাবার বা তরল খেতে দেয়া হবে না। এর পর রোগীকে সামান্য পরিমাণ পানি, পরে তরল খাবার এবং অবশেষে শক্ত খাবার দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না রোগী স্বাভাবিক ভাবে নিয়মিত খাবার খেতে পারছে। ল্যাপারোস্কোপিক এপেন্ডিসেকটোমির পরে সাধারণতঃ রোগীকে ২ দিনেরও কম সময় হাসপাতালে থাকতে হয়। পেট কেটে ওপেন পদ্ধতিতে অপারেশন করা হলে হয়তো তা ৪ দিনে স্থায়ী হতে পারে। যদি রোগীর এপেন্ডিক্স ফেটে যায়, তবে হাসপাতালে ৭ দিন বা তারও বেশি থাকতে হতে পারে। এপেন্ডিক্স ছাড়াও রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন।

যথাসময়ে চিকিৎসা না করলে অতি সামান্য এই রোগ ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে এপেন্ডিক্স ফেটে যেতে পারে, পঁচে যেতে পারে, পেটে পূজ জমে যেতে পারে এমনকি সারা পেটে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা যথেষ্ট জটিল এবং অনেক সময় নীরিহ এই রোগ জীবন সংশয় করতে পারে। বিশেষতঃ শিশু, বৃদ্ধ, ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে এই রোগের জটিলতা অনেক বেশী হয়। তাই জটিলতা এড়ানোর জন্য উচিৎ দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া একটি মারাত্মক বংশগত রোগ। এটি সাধারণত বাবা মায়ের জীনের ত্রুটির কারণে সন্তানদের মধ্যে হয়ে থাকে। যদি বাবা মায়ের জীনে থ্যালাসেমিয়ার বাহক থাকে তবে সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার আশংকা থাকে অনেক বেশি। যাদের থ্যালাসেমিয়া রোগটি খুব অল্প পর্যায়ের হয়ে থাকে তাদেরকে এই রোগের বাহক ধরা হয়। থ্যালাসেমিয়ার বাহকদের কোনো সমস্যা না হলেও দু'জন থ্যালাসেমিয়ার বাহকের বিয়ে হলে তাদের সন্তানকে এই ভয়াবহ রোগটি নিয়ে জন্মাতে দেখা যায়। এই রোগে দেহে রক্ত উৎপন্ন হয় না এবং রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আজীবন শরীরে রক্ত দিয়ে যেতে হয়।

কারণ

জিনগত সমস্যার কারণে থ্যালাসেমিয়া হয়। জিনগত সমস্যার কারণে রক্তের হিমোগ্লোবিনের কোনো কোনো চেইন তৈরি হয় না। হিমোগ্লোবিনের আলফা বা বিটা চেইন যেকোনোটি তৈরিতে সমস্যা হতে পারে। সেখান থেকে এ রোগের সূত্রপাত। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বিটা থ্যালাসেমিয়া রোগীর সংখ্যাই বেশি, অর্থাৎ বেশির ভাগ রোগীরই হিমোগ্লোবিনের বিটা চেইন তৈরিতে সমস্যা হয়। তবে হিমোগ্লোবিনের কোনো নির্দিষ্ট চেইন

তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় দুটি জিনের মধ্যে একটিতে যদি কারও সমস্যা হয়, তাহলে এই রোগে আক্রান্ত হবেন না, কিন্তু তিনি হবেন এই রোগের একজন বাহক। এই রোগের বাহকদের সাধারণত তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তবে একজন বাহক যদি পরবর্তীকালে অন্য একজন থ্যালাসেমিয়া বাহকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে তাঁদের সন্তানের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

লক্ষণ

জিনগত সমস্যার কারণে হয় বলে এ রোগ সাধারণত শৈশবেই দেখা দেয়। রক্তশূন্যতা, জন্ডিস, বারবার বিভিন্ন জীবাণুর সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়া এবং শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে না হওয়া থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ। এসব রোগীর মুখের গড়নেও কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। সাধারণত যকৃৎ ও প্লীহা বড় হয়ে যায়। রক্তশূন্যতা খুব বেশি হলে হৃৎপিন্ড তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে এবং রোগীর শ্বাসকষ্টসহ অন্যান্য উপসর্গ হতে পারে।

চিকিৎসা

থ্যালাসেমিয়া রোগটি দুই পর্যায়ের হতে পারে যেমন - প্রাথমিক এবং মাঝারি থেকে মারাত্মক। দুই পর্যায়ের থ্যালাসেমিয়ার জন্য আলাদা ধরণের চিকিৎসা রয়েছে। তবে রোগটি পুরোপুরি নিরাময় যোগ্য নয়।

প্রাথমিক থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রেঃ প্রাথমিক থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গ খুবই কম থাকে এবং প্রাথমিক থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে খুবই অল্প চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। ব্যতিক্রম কিছু ঘটলে যেমন - কোন বড় অপারেশন করা হলে কিংবা গর্ভবতী মা সন্তান প্রসবের পর অথবা অন্য কোনো কারণে রক্ত দেয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে।

মাঝারি থেকে মারাত্মক থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রেঃ মাঝারি এবং মারাত্মক পর্যায়ের থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে রোগের পর্যায় অনুসারে বছরে বেশ কয়েকবার রোগীকে রক্ত দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। রোগটি একেবারে মারাত্মক পর্যায়ে চলে গেলে বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন হতে পারে এবং এর সাথে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে।

প্রতিরোধের উপায়

কোনো মা-বাবার একটি সন্তান যদি থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়, তাহলে সেই মা যখন তাঁদের পরবর্তী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করবেন, তখন তিনি তাঁর গর্ভের শিশুটিও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত কিনা, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন। এটি জেনে নেওয়া যায় গর্ভকালীন প্রথম তিন মাসের মধ্যেই।

আর বিয়ের আগেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া উচিত, যেন দুজন থ্যালাসেমিয়া বাহকের মধ্যে বিয়ে না হয়। কারণ, দুজন থ্যালাসেমিয়া বাহকের মধ্যে বিয়ে হলে তাঁদের সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি।

সাধারণত থ্যালাসেমিয়া বাহকের মধ্যে রোগের কোনো ধরনের লক্ষণ থাকে না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহক যখন গর্ভাবস্থায় থাকেন, তখন তাঁর রক্তশূন্যতা হলে তা আয়রন, ফলিক অ্যাসিড বা অন্য কোনো ওষুধ সেবনের মাধ্যমে ভালো হয় না। এ ছাড়া বাহকের তেমন কোনো সমস্যাই হয় না।

সতর্কতা

থ্যালাসেমিয়ার রোগীকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে রোগের পর্যায় অনুযায়ী বছরে ৮ থেকে ১০ বার রক্ত দিয়ে যেতে হয়। এতে করে প্রতি ব্যাগ রক্তের সঙ্গে শরীরে জমা হয় বাড়তি আয়রন। এই অতিরিক্ত আয়রন লিভার ও প্যানক্রিয়াসে গিয়ে জমা হতে থাকে। এই দুটি অংশে ইনসুলিন উৎপন্ন হয়। আয়রন জমা হওয়ার ফলে লিভার সিরোসিস ও ডায়বেটিস রোগের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সুতরাং ডাক্তারের কোনো প্রকার নির্দেশনা ছাড়া আয়রণযুক্ত ঔষধ, ভিটামিন বা অন্যকোন ঔষধ খাওয়া যাবে না। এবং রোগীকে সব সময় সুষম ও পুষ্টিকর খাবার বিশেষ করে ক্যালসিয়াম, জিংক, ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। যাতে অন্য কোন জীবানু দ্বারা আক্রান্ত না হতে পারেন সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বিয়ের ব্যাপারে সতর্কতা

বিয়ের আগে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন রয়েছে। যদি একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক হয়ে থাকে তবে অবশ্যই বিয়ের আগে হবু সঙ্গী থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা তা পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে। কারণ দুজনেই বাহক হলে সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যদি দুজনের মাত্র একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক হয় তাহলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ "রক্তশূন্যতা" থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই কার্ডটি আগামী ১৭ নভেম্বর ২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১) পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার কত ভাগ লোক রক্তশূন্যতায় ভুগে থাকেন?

ক) ১০ ভাগ
খ) ২০ ভাগ
গ) ৩০ ভাগ
ঘ) ৪০ ভাগ

২) নিচের কোনটি রক্তশূন্যতার কারণ নয়?

ক) আয়রনের অভাব
খ) থ্যালাসেমিয়া
গ) হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া
ঘ) সিসটিক ফাইব্রসিস

৩) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা -

ক) ১৩ গ্রাম / ডেসিলিটার
খ) ১২ গ্রাম / ডেসিলিটার
গ) ১১ গ্রাম / ডেসিলিটার
ঘ) ১০ গ্রাম / ডেসিলিটার

৪) অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণ কোনটি?

ক) ঘন ঘন গর্ভধারণ
খ) অতিরিক্ত মাথাব্যথা
গ) হেপাটাইটিস
ঘ) কিডনিতে পাথর

৫) নিচের কোনটি রক্তশূন্যতার লক্ষণ নয়?

ক) অতিরিক্ত ক্লান্তি
খ) অতিরিক্ত চুল পড়া
গ) মাথা ঝিমঝিম ও ব্যথা করা
ঘ) ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া

৬) রক্তশূন্যতার প্রধান কারণ কোনটি?

ক) রক্তের বিলিরুবিন কমে যাওয়া
খ) অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা কম তৈরি হওয়া
গ) অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা বেশি তৈরি হওয়া
ঘ) ওপরের কোনটি নয়

৭) কোন কোন খাবার মানুষের পাকস্থলিতে আয়রনের শোষণের মাত্রা কমিয়ে দেয়?

ক) দুগ্ধজাতীয় খাবার
খ) চা
গ) কফি
ঘ) ওপরের সবকয়টি

৮) রক্তের কোন পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তশূন্যতা বোঝা যায়?

ক) রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা
খ) রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা
গ) রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা
ঘ) রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা

৯) নিম্নের কোন ভিটামিনটির অভাবে রক্তশূন্যতা হয়ে থাকে?

ক) ভিটামিন বি$_{৬}$
খ) ভিটামিন বি$_{১২}$
গ) ভিটামিন বি$_{১}$
ঘ) ভিটামিন বি$_{২}$

১০) নীচের কোন রোগটিতে রক্তশূন্যতা হয় কিন্তু শরীরে আয়রনের অভাব হয় না?

ক) পাইলস
খ) পেপটিক আলসার
গ) থ্যালাসেমিয়া
ঘ) বক্র কৃমির সংক্রমণ

মাত্র ২ মিনিটে হেঁচকি থামাবার ৯ টি সহজ উপায়

১ জিহ্বা টেনে ধরে রাখুন

শুনতে অদ্ভুত শোনালেও এটা কিন্তু বেশ কার্যকর। অনবরত হেঁচকি উঠলে জিহবা বের করে আঙ্গুল দিয়ে টেনে ধরে রাখুন কিছুক্ষণ! হেঁচকি থেমে যাবে নির্ঘাত!

২ এক চামচ পিনাট বাটার খেয়ে নিন

পিনাট বাটার তো এমনিতেই খেতে বেশ ভালো। তাই হেঁচকি উঠলে দেরী না করে ঝটপট খেয়ে নিন এক চামচ পিনাট বাটার। হেঁচকি থেমে যাবে।

৩ এক চামচ চিনি

ওজন কমাতে চিনি থেকে আপনি দূরে থাকলেও হেঁচকি উঠলে এক চামচ চিনি খেয়ে নিতে ইতস্তত করবেন না যেন! এক চামচ চিনি আপনাকে অনবরত হেঁচকির যন্ত্রণা থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি দিতে সক্ষম।

৪ কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখুন

দু কানের ফুটোয় আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রাখুন এমনভাবে যেন আপনি কিছুই শুনছেন না। তবে অতিরিক্ত জোরে চেপে ধরবেন না যেন। কিছুক্ষণ এভাবেই থাকুন। দেখবেন হেঁচকি গায়েব!

৫ পানি পান বা গার্গল করুন

বড় এক গ্লাস পানি পান করুন অথবা গার্গল করার চেষ্টা করুন। হেঁচকি থামাতে চমৎকার কাজে দেবে!

৬ নিঃশ্বাস আটকে রাখুন

বড় একটি নিঃশ্বাস নিন এবং যতক্ষণ সম্ভব আটকে রাখার চেষ্টা করুন। সেই সাথে নাক চেপে রাখতে ভুলবেন না, যাতে বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে।

৭ নিজেকে ভয় পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন

নিজেকে ভয় পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। কেননা আপনি ভয় পেলে তা আপনার নার্ভগুলোকেও চমকে দেয়। আর সে কারণেই আপনার হেঁচকিও থেমে যায়। তাই হেঁচকি উঠলে হরর মুভি দেখা শুরু করুন!

৮ একটি কাগজের ব্যাগে শ্বাস প্রশ্বাস নিন

একটি কাগজের ব্যাগ নিন আর তাতে মুখ রেখে শ্বাস প্রশ্বাস নিন। এতে আপনার রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় আর সেই সাথে এটি হেঁচকি থামাতেও দারুণভাবে কাজ করে।

৯ একটি এন্টাসিড ট্যাবলেট

এতো কিছু করার পরেও যদি আপনার হেঁচকি না থামতে চায় তবে শেষ উপায় একটি এন্টাসিড ট্যাবলেট। কেননা এতে আছে প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম, যা আপনার নার্ভগুলোকে শান্ত করে, ফলে হেঁচকি থেমে আসে আপনি আপনিই!

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ACI
ADVANCING
POSSIBILITIES